57

তারিখ ..02 APR 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ... ৫ .. কলাম .. ১......

দৈনিক বাংলা

মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা ঃ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি আবশ্যক বিষয় হচ্ছে। এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে ক'দিন আগে। এ বছর থেকেই ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত এ বিষয়টি পড়ানো শুরু হবে। দশম শ্রেণীতে শুরু হবে পরের বছর।

এই নতুন বিষয় চালু করার ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে। এ বিষয়ে অন্তত থাকবে মাছ চাষ, পশু পালন, হাঁস–মুরগীর খামার, শাক–সব্জি তৈরি, চিংড়ি চাষ, নার্সারী এবং প্লান্টিং। এ ধরনের শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে হাতে কলমে কিছু শেখানো। জীবন ধারণ করার একটি বিকল্প পথ সম্পর্কে ছাত্র জীবন থেকেই প্রশিক্ষণ দেয়া। এ বৃত্তিমূলক কাজ তরুণ–তরুণীদের ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক কাজে আসবে।

হিসাব নিয়ে দেখা গেছে আমাদের দেশে প্রায় ৪০ লাখ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই উচ্চ মাধ্যমিক পার হতে পারে না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বৃত্তিমূলক কোন প্রশিক্ষণ না থাকায় তারা বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এদের জন্য চাকরি পাওয়া সহজলভ্য নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে বেকার সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে। অনেকেই হতে পারে স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর।

জানা গেছে, কৃষি বিষয়ে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা হবে। ৬০ ভাগ হবে তত্ত্বীয় এবং ৪০ ভাগ ব্যবহারিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই শিক্ষা কোথায় দেয়া হবে এবং কি করে দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব খামার থাকবে। অথবা কৃষকের খামারে ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলে মাছ, পশুপালন, বন ও পরিবেশ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতাকরবে।

প্রস্তাবনা হিসাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ নেই। আমাদের বাংলাদেশ বড় একটি গ্রাম। কৃষি অর্থনীতি হচ্ছে বাংলাদেশের সব কিছুর ভিত্তি। তাই এ ব্যাপারে জ্ঞান আহরণ স্বাভাবিকভাবে অপরিহার্য। এ ব্যাপারে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু আজকে আমাদের গ্রাম–গ্রামান্তরে বিদ্যালয়গুলির যে হাল তাতে হঠাৎ করে এ বিষয়টি চালু করা সহজ হবে কি! এমনিতেই বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের অভাব প্রকট। মেধাবী ছাত্র এ পেশায় যোগ দিতে চায় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেতন সরকারী অনুদান নির্ভর। ছাত্রদের বেতন থেকে শিক্ষকদের বেতন হয় না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই। সীমিত সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাতে হয়। পরিদর্শক এলে ভিন্ন স্কুল থেকে শিক্ষক ধার করে শেষ রক্ষা করতে হয়।

গ্রাম–গ্রামান্তরের উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কোন ল্যাবরেটরী নেই। হাতে কলমে কিছু শিখানো হয় না। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের প্রভাব থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পাসের অসুবিধা হয় না। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা তত্ত্বীয় পরীক্ষা থেকে অনেক বেশী নম্বর পায়। অথচ এ ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে ল্যাবরেটরীর কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষকের বার বার পরিবর্তনের ফলে গ্রাম বাংলার বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাহত হয় প্রতি পদে পদে।

এ খবর কেউ জানেন না তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ পরিস্থিতি একান্তই খোলামেলা। বিদ্যালয়গুলিতে অনেক কিছু নেই। এ অজুহাতে প্রায়ই সরকারী অনুদান বন্ধ করা হয়। আবার সবই ঠিক ঠাক হয়ে যায়। শুধু লেখাপড়ার পরিস্থিতি যেমন ছিল তেমনই থাকে।

এ পরিস্থিতিতে কৃষিকে আবশ্যক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। বলা হয়েছে সকল বিদ্যালয়ে কৃষি খামার থাকবে। বাংলাদেশে অনেক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠই নেই। সুতরাং এ মুহূর্তে কৃষি খামারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। বলা হয়েছে এ ব্যাপারে কৃষকদের খামারে সুবিধা নেয়া যেতে পারে। তাও সহজসাধ্য নয়। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার খামারে কে কবে কোন শস্য ফলাবে তার নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ সব কিছুই অনিশ্চিত।

এর পর আছে শিক্ষকের সমস্যা। প্রস্তাবনায় বলা হচ্ছে শিক্ষক না পাওয়া পর্যন্ত মাছ, পশু পালন, বন, পরিবেশ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। বাংলাদেশের হাজার হাজার বিদ্যালয়ে কখন কিভাবে বিভিন্ন বিভাগ থেকে নিয়ে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে তা সাধারণভাবে বুঝামুশকিল।

নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট বক্তব্য আছে। এছাড়া কৃষি বা বন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছে কি!

তবে এ ব্যাপারে অতীতের অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর নয়। এককালে এসএসসিতে কৃষি গ্রুপ ছিল। ছাত্রও কম ছিল না। তবে প্রায় কোন বিদ্যালয়েই কৃষি বিষয়ে শিক্ষক ছিল না। হাতে কলমে শেখাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন কিছু না শিখে ভাল নম্বর পাবার ব্যবস্থা ছিল। এই ছাত্রছাত্রীরা কৃষি বিষয়ের বদৌলতে এসএসসিতে ভাল ফল করত। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে এসে হালে পানি পেত না। কোন কোন বিদ্যালয়ে শিল্প বিষয়েও পড়ানো হত। এই বিষয়েও ছাত্ররা ভাল ফল করত। এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বোর্ডের পরীক্ষায়ও শীর্ষে স্থান দখল করত। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে তাদেরও পাত্তা পাওয়া যেত না। এই পরীক্ষার ফল ভাল করার ব্যাপারে আর একটি বিষয় হচ্ছে টাইপ রাইটিং। শহর এলাকায় অনেক বিদ্যালয়ে এ বিষয়টি পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এবং এ বিষয়ে পরীক্ষা দিলে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ নম্বর পাওয়া আদৌ কষ্ট কর নয় এবং এভাবে অনেকেই পরীক্ষায় সুফল পেয়েছে। যাদের বিদ্যালয়ে টাইপ রাইটিং নেই তারা মেধাবী হয়েও পরীক্ষায় প্রথম দিকে থাকতে পারেনি।

জানি না শিক্ষাবোর্ড, শিক্ষা দফতর এ সম্পর্কে কতদূর খবর রাখেন। আমি যতদূর জানি বিজ্ঞানসহ বৃত্তিমূলক শিক্ষার হাল কোথায়ও ভাল নয়। যে কলেজে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নেই একযুগ ধরে সে কলেজ থেকেও বিজ্ঞানে পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে ছাত্রছাত্রী পাস করছে। এর উদাহরণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। তাই আমার আবেদন হচ্ছে– কৃষি শিক্ষা চালু করুন আপত্তি নেই। কিন্তু এ কৃষিকে আবশ্যিক করার আগে দেশের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির হাল পুঙ্খানুপুঙ্খ জানার চেষ্টা করা হোক।

এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উল্লেখ্য যে, সম্প্রতিকালে সরকার কোন বিদ্যালয় আর সরকারীকরণ করছেন না। তাই দেশের প্রধান শিক্ষার বাহন বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চবিদ্যালয় হওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন যে এ বিদ্যালয়গুলির পক্ষে এ নতুন দায়িত্ব পালন আদৌ সম্ভব হবে কি না, কখন হবে বা কিভাবে হতে পারে– নিশ্চয়ই শিক্ষার নামে ফাঁকি দেয়ার চেয়ে শিক্ষা না দেয়াই শ্রেয়।

—নির্মল সেন